POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ○

এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

(আলে ইমরান: ১০৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 আগস্ট, 2019 28যুল কাদা 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তোমরা যদি নিজেদের সন্তানদেরকে খৃষ্টান,আর্য ও অন্যদের সঙ্গ সাহচর্য থেকে বিরত রাখ না বা বিরত রাখতে না চাও, তবে এর দ্বারা নিজের উপরই নয় বরং সমগ্র জাতির উপর, ইসলামের উপর ভয়ানক অত্যাচার করছ। এর অর্থ এই দাঁড়ায় ইসলামের আত্মাভিমান নিয়ে তোমাদের কোন শিরপীড়া নেই। নবী করীম (সা.)-এর প্রতি তোমাদের মনে কোনও সম্মান অবশিষ্ট নেই।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

ইসলামের খোদা

বর্তমান যুগে ধর্মের সেবা এবং আল্লাহ্‌র বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করা এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসনা আবশ্যক। কিন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের সতর্ক করতে চাই যে, যারা কেবল একপেশে জ্ঞানচর্চাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাতে এতটাই আত্মবিলীন হয়ে পড়ে যে তারা কোন সাধু বা আধ্যাত্মিক পুরুষের সহচর্যে বসার সুযোগ পায় না এবং যাদের নিজস্ব কোন আধ্যাত্মিক জ্যোতি নেই তারা সচরাচর এবিষয়ে হোঁচট খেয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। তারা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামের আলোকে যাচাই করার পরিবর্তে উল্টো ইসলামকেই জাগতিক চিন্তাধারার অধীনস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আর এইভাবে তারা নিজেদের কল্পনায় দেশ ও জাতির সেবার ক্ষেত্রে ত্রাতা হয়ে ওঠে। কিন্তু স্মরণ রেখো! এই কাজ, অর্থাৎ ধর্মের সেবা, সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজ করে।

বস্তুতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই শিক্ষা খৃষ্টবাদ ও দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় এর অনুরাগীরা নিজেদের সহজাত ঝোঁক এবং ধর্মের গুণগ্রাহী হওয়ার কারণে কিছু দিন ইসলামী রীতি-নীতি মেনে চলে ঠিকই, কিন্তু জাগতিক শিক্ষার প্রাঙ্গণে তাদের পদচারণা যতবৃদ্ধি পায় ততই তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং অবশেষে কেবল নিছক ধর্মানুষ্ঠানটুকুই অবশিষ্ট থাকে, তাতে কোনও সারবত্তা থাকে না। মানুষ একতরফা গবেষণা এবং শিক্ষালাভে নিমগ্ন থাকার কারণেই এই পরিণাম সৃষ্টি হয় এবং অতীতেও হয়েছে। নিজেদেরকে জাতির নেতা হিসেবে পরিচয়দানকারী এমন অনেকেই এই সত্যটি অনুধাবন করে উঠতে পারে নি যে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন তখনই উপযোগী সাব্যস্ত হয়, যখন তা কেবল ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে করা হয় আর খোদার খোদার কোন পুণ্যাত্মা ও আধ্যাত্মিক পুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিবাদরূপী নাস্তিকতা প্রসারের কারণ হল ইসলামের উপর প্রকৃতিবাদী, দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে অবিশ্বাসের বিষ দ্বারা শাণিত আক্রমণের মোকাবেলায় মুসলমানেরা অসার যুক্তিবাদ ও অনুমানভিত্তিক দলিলের আশ্রয় নিয়েছে। কেননা তারা ইসলামের শিক্ষা এবং স্বর্গীয় জ্যোতিকে অনুপযুক্ত মনে করেছে। পরিণামে এমন ব্যর্থতা স্বীকারকারীরা কুরআন করীমের নিগূঢ় অর্থ এবং উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে যায় আর তাদের হৃদয় এক সুপ্ত অধার্মিকতার আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রযুক্ত না হলে অবশেষে সে নাস্তিকতার বেশ ধারণ করে সেই রঙে রঙীন হয়ে যায় যা এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

আরও একটি বিপদ যা বর্তমানের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মহামারির রূপ ধারণ করেছে সেটি হল তারা ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণত অজ্ঞ। কাজেই যখনই কোন জ্যোর্তিশাস্ত্রী বা দার্শনিক দ্বারা উত্থাপিত কোন আপত্তি চোখে পড়ে, তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় দানা বাঁধে এবং অবশেষে তারা খৃষ্টান বা নাস্তিক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের পিতামাতাও তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য ন্যূনতম সময়টুকুও না দিয়ে এক ভয়াবহ অত্যাচার করে, শৈশব থেকেই তাদেরকে এমন জীবিকা বা কর্মব্যস্ততার মধ্যে ফেলে রাখে যা তাদেরকে এই পবিত্র ধর্ম থেকে বঞ্চিত করে রাখে।

ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষন লাভের জন্য উপযুক্ত সময়

এটিও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য কিশোরকালই সব থেকে উপযুক্ত সময়। বুড়ো বয়সে আরবীর প্রাথমিক ব্যাকরণ শেখা আরম্ভ করে কেউ কতটুকুই বা অর্জন করে ফেলবে? কিশোরবস্থায় স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে থাকে যা মানুষের জীবনের অন্য কোন সময়ে থাকে না। কৈশোরের কিছু কথা তো আমার আজও স্মরণে আছে, কিন্তু পনেরো বছর পুরোনো ঘটনাগুলির অধিকাংশই ভুলে বসেছি। এর কারণ হল জীবনের প্রথম পর্যায়ের শিক্ষাগুলি এত দৃঢ়ভাবে মনের গভীরে গেঁথে যায় আর বুদ্ধির বিকাশের সময় হওয়ার দরুণ সেগুলি তাদের জন্য এমনই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে যা মস্তিষ্ক থেকে কখনই মুছে যায় না। যাইহোক এটি এক দীর্ঘ আলোচনা। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষা দানের সময় এবিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে যেন ধর্মীয় শিক্ষা শৈশবেই লাভ হয়। শুরু থেকে এটিই আমার ইচ্ছা ছিল আর এখনও রয়েছে। খোদাতা'লা সেই বাসনা পূর্ণ করুন। দেখ, তোমাদের প্রতিবেশী জাতি- যেমন আর্যরা শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে! কলেজের জন্য ভব্য অট্টালিকা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে কয়েক লক্ষ টাকা একত্রিত করে ফেলেছে। যদি মুসলমানেরা নিজেদের সন্তানের শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ না দেখায়, তবে আমার এই কথাটি শুনে রাখ, এক সময় আসবে যখন তারা সন্তানদের হারিয়ে বসবে।

সাহচর্যের প্রভাব

একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হল- 'তুখম তাসির সোহবত রা আসার'। প্রবাদটির প্রথমাংশটি নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ 'সোহবত রা আসার' অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সঙ্গ অবশ্যই মানুষের উপর প্রভাব ফেলে'- এটি এমন এক সর্বজনস্বীকৃত সত্য যা নিয়ে অধিক বিতর্কের প্রয়োজন নেই। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা কিভাবে খৃষ্টানদের ফাঁদে পড়েছে, এমনকি বহু মুসলিম সাধু ও পবিত্রাত্মাদের সন্তান এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তরাধিকারীরাও হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর যেভাবে অবমাননা করেছে, তার সাক্ষী আপনারা প্রত্যেকেই। আমি সৈয়্যদদের বংশধরদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে দেখেছি যারা নিজেদেরকে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর প্রকৃত বংশধর হিসেবে দাবি করে অথচ এরাই আবার ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রকারের অপত্তি উত্থাপন করে।

শেষাংশ ১০ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া:

প্রেসব্যাটিরিয়ান চার্চের অধিকর্তা মিশেল সাহেবা বলেন: হুযুর আনোয়ারের শান্তির বার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি পারস্পরিক ঐক্য ও সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন এবং ভীতির পরিবেশ দূর করে ভালবাসার পরিবেশ তৈরী করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা অসাধারণ ছিল। এছাড়াও তিনি প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ করার শিক্ষারও উল্লেখ করেছেন। এটি আমার জন্য নতুন বিষয় ছিল। আজ আমি জানতে পারলাম যে খৃষ্টধর্মে যে ভালবাসার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এগুলিও তো ঠিক সেই একই শিক্ষা। অথচ মিডিয়া সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমি ভীষণ আনন্দিত যে তিনি আমাদের সামনে এই তথ্য তুলে ধরেছেন।

একজন ইতিহাসবিদ ড: ফাতেমা সাহেবা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতির কথা উল্লেখ করে বলেন: যুক্তরাষ্টে ইসলাম সম্পর্কে আমি গবেষণা করেছি। এবিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি। আমি কোন ধর্মীয় বিদ্বান নই, বরং একজন ইতিহাসবিদ মাত্র। হুযুর আনোয়ার বলেছেন এইযুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ইসলামের সংস্কারক হিসেবে এসেছিলেন। তাই আমার মনোযোগ এদিকেই নিবদ্ধ আছে আর এবিষয়ে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এখন গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু কেবল মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই নয়, বরং তাঁর লেখনী এবং নির্দেশাবলীও আমার নজরে থাকবে যেগুলির মাধ্যমে তিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। শান্তি প্রসঙ্গে তাঁর বাণী বিস্ময়করভাবে সুন্দর। ইসলামের সদাচরণের শিক্ষাকে তিনি কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতিও সদাচারী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হল আমরা যেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে মানবকল্যাণের জন্য কাজ করি। কতই না সুন্দর এই বাণী! মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই এক মহান মুসলমানের পক্ষ থেকে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত আর আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: প্রতি রবিবার আমি গীর্জায় গিয়ে পৃথিবীর শান্তির জন্য দোয়া করি। হুযুর আনোয়ার বলেছেন, আমাদের পরস্পরের কাছে আসতে হবে, পরস্পরের ধর্মমত,বিশ্বাস ও জাতিগত ঐতিহ্য সম্পর্কে ভীত হওয়ার পরিবর্তে তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে। আমাদেরকে এমনটিই হতে হবে। আমি এজন্যই এখানে এসেছি। আমার বাসনা হল হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করা, কিন্তু এখানে অনেক মানুষ রয়েছেন, তাই হয়তো আমার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

এক ছাত্রী নিজের আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করে বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। এখানে এসে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। হুযুর আনোয়ার বলেছেন আমরা সকলেই মানুষ। এর দ্বারা হুযুর বোঝাতে চেয়েছেন যে আমরা মানুষ হিসেবে যখন এক, তখন আমাদের মধ্যে কোন প্রকার ঘৃণা অবশিষ্ট থাকা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এছাড়াও হুযুর আনোয়ার বলেছেন,এখন আমাদেরকে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কাজ করতে হবে। একথাটি আমার ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেছে। তাঁর ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল।

ক্যাপ্টেন জোযেফ কোঙ্গার সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: কিছুকাল যাবৎ জামাতের সঙ্গে আমার পরিচিতি আছে। এই জামাত পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিপ্রিয় সমাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন এক উচ্চমানের- নেতৃত্ব যেমন হুযুর আনোয়ার।

সেক্রেটারী অফ স্টেট রবিন জন স্মিথ অনুষ্ঠানের পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভাল লাগল। মধ্যহ্ন ভোজনের সময় হুযুরের কাছেই আসন পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। অপরদিকে হুযুর আনোয়ারের ভাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উভয়ের সঙ্গে আমার বেশ কথোপকথন হয়েছে। আমার মতে, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার প্রতি আহ্বান জানানো এক শক্তিশালী বার্তা ছিল। আমি বিগত চার বছর থেকে দেখে আসছি যে, অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বেশ উপকার হয়েছে। হুযুর আনোয়ার যে উপদেশাবলী দান করেছেন, আমার মতে, সেগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের উন্নতির চাবিকাঠির ভূমিকা পালন করবে। অনেক সময় আমাদের সমাজের জন্য সংকটপূর্ণ সময়ও আসে, কিন্তু পাশাপাশি গঠনমূলক কাজও অব্যাহত আছে, যেমন আজকের দিনের অনুষ্ঠানটি। আমার মতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ধরণের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর বার্তায় সমস্ত দিক সমাবিষ্ট ছিল।

অনুষ্ঠানে এক পাদ্রী ফাদার জো অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: আপনাদের খলীফার ব্যক্তিত্বে আমি প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর আগমণে পরিবেশে এক অবর্ণনীয় প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বাণীও ছিল ভালবাসা ও আন্তরিকতয় পরিপূর্ণ। আমি আযান শুনেছিলাম যা মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছে।

হুযুরের বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর অনুষ্ঠানটিও ছিল সময়োপযোগী। তাঁর ভাষণের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কেননা, আমি বাল্টিমোরে একাধিক বার আহমদীয়া মসজিদে গিয়েছি। তাদের সমস্ত মসজিদ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উন্মুক্ত, আমি সেখানে বেশ কয়েকবার জুমাতেও গিয়েছি। খলীফা যা কিছু বলেছেন আমি সেগুলির প্রত্যেকটির বাস্তব দৃষ্টান্তের সাক্ষী। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যে একত্রিত হয়ে শান্তির কথা বলছে-আজ এই শহর ও সারা বিশ্বের এটিরই বিশেষ প্রয়োজন। খলীফা এবং জামাত আহমদীয়া আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি চাই আরও এই ধরণের উপলক্ষ্য তৈরী হোক যেখানে আহমদীয়া জামাত তাদের ব্যবহারিক নমুনা দ্বারা সমাজের শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনতে নিজেদের ভূমিকা রাখবে।

এক ভদ্রমহিলা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: এই সুন্দর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ারের উপস্থিতি আমাদের সকলকে আভিভুত করেছে। আমি তাঁর প্রত্যেকটি কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলাম। আমি বেশ কয়েকবার নিজের এলাকার মসজিদে গিয়েছি। হুযুর আনোয়ারের কথা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি যেন হৃদয়ের গভীর থেকে বলছিলেন। তিনি মসজিদকে শান্তি, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের স্থান হিসেবে আখ্যায়িত করছিলেন আর আমি নিজেই এর সাক্ষী। এখানে এসে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমি অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি, কিন্তু হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে এক আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর কথাগুলি শুনে মনে হয় তিনি মন থেকে বলছেন। সব থেকে বড় কথা তাঁর কোন গোপন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। এটি আমার মনে তাঁর প্রতি সমীহ জাগায়। তিনি যা কিছু বলছিলেন তা সবই ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা আর মনে হচ্ছিল এই ব্যক্তি যা কিছু বলছে তা সবই মনের কথা। তিনি অত্যন্ত সদয়, স্নেহশীল,মিষ্টভাষী এবং বিশ্বের জন্য একজন প্রকৃত শান্তিকামী মানুষ। তাঁকে কোন গোপন উদ্দেশ্য নেই বা পরিকল্পনা নেই।

বাল্টিমোর শহরের মেয়র ক্যাথেরিন পাঘ সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন:হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি আনন্দিত। প্রথম যে জিনিসটি আমি অনুভব করেছি সেটি হল তাঁর উপস্থিতিতে পরিবেশ যেন নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। তিনি শান্তি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। বর্তমানে এই শান্তির বার্তার সবথেকে বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শুধু আমাদের শহর, প্রদেশ বা দেশের জন্যই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের আজ এই বার্তা ভীষণভাবে প্রয়োজন। আমি মনে করি, এই বার্তা সকলেরই শোনা উচিত। এই বার্তা শুনলে জানতে পারব যে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাবলী সমাধানের জন্য শান্তিই একমাত্র পথ। এই সত্য অনুধাবন করলে আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে শিখব। হুযুর আনোয়ার সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বঞ্চিতদের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করব তা আমাদের সকলকে প্রভাবিত করবে। পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী আমাদের সকলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে অস্ত্র রাখার ব্যপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের পরস্পরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা উচিত এবং বোঝানো উচিত যে, জীবন অত্যন্ত মূল্যবান,এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আর প্রত্যেকের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবেই আমরা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ মি. রবার্ট ডিউ বেরি সাহেব বলেন: এখানে এসে চমৎকৃত হয়েছি। আপনাদের আধ্যাত্মিক নেতার বক্তব্য হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্যমের সঞ্চার করেছে। খলীফা এক বিশ্বজনীন বার্তা দিয়েছেন। খলীফার ব্যক্তিত্বকে এক

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

যদি জঙ্গলের হিংস্র পশুরা মদিনায় প্রবেশ করে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি সেই কাজ করা থেকে বিরত হব না যে কাজ করার নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদান করেছেন।

খোদার কসম! সে-ও অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসা নিজের মাঝে আমীর হওয়ার গুণাবলী লালন করত এবং তার পরে তার ছেলেও নিজের মাঝে আমীর হওয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সে তাদের অন্তর্গত ছিল যারা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং এরা দুজনই নিশ্চিতভাবে সকল প্রকার কল্যাণ লাভের অধিকার রাখে।

হযরত যায়েদ বিন হারেসা এবং হযরত উসামা (র.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা

যুগ খলীফাকে দেখার আগ্রহে এবং জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সুদূর আফ্রিকা থেকে পাকিস্তান পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারী মুবাল্লিগ মাননীয় মহম্মদ সিদ্দীক দুম্বিয়া (আইভোরি কোস্ট) এবং কর্তব্যরত মুবাল্লিগ মাননীয় গোলাম মোরতুজা সাহেব (বরুন্ডী) -এর পিতা মিঞা গোলাম মুস্তাফা সাহেবের মৃতু। মৃতদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৮ শে জুন , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৮ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আরো কতিপয় ঘটনা ও উদ্ধৃতি রয়েছে, যেগুলো আজ আমি উপস্থাপন করব। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র একটি সারিয়া বা অভিযান যা ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে বনু সুলায়েম এর প্রতি করা হয়েছিল, এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) তাঁর মুক্ত দাস এবং সাবেক পালক-পুত্র যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে কতিপয় মুসলমানকে বনু সুলায়েম গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি তখন 'নাজাদের জমুঁ নামক স্থানে বসবাস করতো আর দীর্ঘকাল যাবৎ মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতো, চক্রান্ত করতো এবং যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। যেমন খন্দক বা পরিখার যুদ্ধেও এই গোত্রটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন 'জমুঁ' এ পৌঁছান, যা মদিনা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন সেখানে কেউ ছিল না, তারা খালি জায়গা দেখতে পান। কিন্তু মুযায়না গোত্রের হালীমা নামক এক ইসলাম বিরোধী মহিলা তাদেরকে সেই জায়গার সন্ধান প্রদান করে যেখানে সে সময় বনু সুলায়েম গোত্রের একাংশ নিজেদের গবাদি পশু চরাচ্ছিল। অতএব, এই সংবাদকে লুফে নিয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেই স্থানে অতর্কিত হামলা চালান এবং এই অতর্কিত আক্রমণে ভীতত্রস্ত হয়ে অধিকাংশ মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যায় কিন্তু কয়েকজন বন্দি হয় এবং গবাদিপশু মুসলমানদের হস্তগত হয়। সেগুলো নিয়ে তারা মদিনায় ফিরে আসেন। দৈবক্রমে এই বন্দিদের মাঝে হালীমার স্বামীও ছিল আর যদিও সে যুদ্ধ-বন্দী ছিল কিন্তু মহানবী (সা.) হালীমার সেই সাহায্যের কারণে হালীমাকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন , এমনকি তার স্বামীকেও অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দেন আর হালীমা ও তার স্বামী খুশি মনে স্বদেশে ফিরে যায়।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৬৯)

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে 'ঈস' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে হয়েছিল, সেটির উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা হয়েছে যে,

যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এর সেই অভিযান অর্থাৎ সারিয়া বনু সুলায়েম থেকে ফিরে আসার পর কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই মহানবী (সা.) জমাদিউল আওয়াল মাসে তাকে একশ' সত্তর জন সাহাবীর নের্তৃত্ব প্রদান করে পুনরায় মদিনা থেকে প্রেরণ করেন আর ইতিহাসবিদরা এই অভিযানের কারণ যা লিখেছে তা হলো, সিরিয়া থেকে মুক্কার কুরাইশদের একটি কাফেলা আসছিল আর তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) এই দলটিকে প্রেরণ করেছিলেন।

এখানে এ ব্যাখ্যাও দিতে চাই যে, কুরাইশদের কাফেলা সাধারণত সশস্ত্র থাকতো আর মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াতকালে তারা মদিনার একেবারে পাশ ঘেঁষে যাতায়াত করতো যে কারণে সর্বদা তাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কা থেকেই যেত। এছাড়া এসব কাফেলা যেদিক দিয়েই যেতো আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতো ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এ কারণে গোটা দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার এক ভয়াল অগ্নি জ্বলছিল, এজন্য তাদের দমন করা অনিবার্য ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) (কুরাইশদের) কাফেলার সংবাদ পেয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সেদিকে প্রেরণ করেন আর তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এবং সংগোপনে এগিয়ে যান যাতে কেউ টের না পায়, আর 'ঈস' নামক স্থানে গিয়ে সেই কাফেলাকে ধরে ফেলেন। 'ঈস' একটি জায়গার নাম, যা মদিনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। যেহেতু এটি অতর্কিত আক্রমণ ছিল তাই কাফেলার লোকেরা মুসলমানদের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারে নি আর নিজেদের সকল মালপত্র ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। যায়েদ (রা.) কয়েকজন বন্দি এবং কাফেলার মালপত্র করতলগত করে মদিনায় ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৭০)

একথা স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক সারিয়া অভিযান অথবা যে যুদ্ধই হয়েছে, যে সৈন্যবাহীনিই প্রেরণ করা হয়েছে এর কারণ হলো, (কাফিরদের) কাফেলার পক্ষ থেকে কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যেতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে (এরা) ষড়যন্ত্র করছে অথবা কোন চক্রান্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এরপর হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে 'তারাফ' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উল্লেখও পাওয়া যায় আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এর উল্লেখ করেছেন যে,

বনু লেহইয়ান যুদ্ধের কিছুকাল পরে ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে পনেরজন সাহাবীর একটি দলকে 'তারাফ'এর দিকে প্রেরণ করেন, যা মদিনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত আর সে সময় ঐ স্থানে বনু সালেবা গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। কিন্তু যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই এই গোত্রের লোকেরা আগাম সংবাদ পেয়ে এদিকে-সেদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর যায়েদ (রা.) ও তার সঙ্গীরা (তাদের) অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং এরপর মদিনায় ফিরে আসেন আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন নি এবং তাদের সন্ধানও করেন নি।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮০-৬৮১)

এরপর যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়া বা অভিযান রয়েছে

যা ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে হিসমা-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন,

এই জমাদিউল আখের মাসেই মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে পাঁচশ' মুসলমানসহ হিসমা-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যা মদিনার উত্তর দিকে বনু জুযাম এর নিবাস ছিল। তারা সেখানে বসবাস করতো। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী, যার নাম ছিল দাহিয়া কালবী, তিনি রোমান সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন আর তার সাথে কিছু মালপত্রও ছিল, যার কিছু সম্রাটের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ছিল আর কিছু ছিল পোশাক আর ছিল কিছু বানিজ্যিক পণ্য। দাহিয়া (রা.) যখন বনু জুযাম এর এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন ঐ গোত্রের নেতা হুনায়েদ বিন আরেয নিজ গোত্রের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে দাহিয়া (রা.)'র ওপর আক্রমণ করে বসে এবং সব মালপত্র ছিনিয়ে নেয়, বানিজ্যিক পণ্য এবং অন্যান্য মালপত্রও যা কিছু সম্রাট দিয়েছিলেন তা-ও। এমনকি এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, দাহিয়া (রা.)'র দেহেও ছেড়া কাপড় ছাড়া কোন কিছুই আর বাদ রাখেনি। বনু যুবায়েব যখন এই আক্রমণের সংবাদ পায়, যারা বনু জুযাম এর একটি শাখা ছিল যাদের কতক মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা বনু জুযামের সেই দলটির পিছু ধাওয়া করে তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সামগ্রী ছিনিয়ে আনে এবং দাহিয়া (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন সেই মালপত্র নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। এখানে এসে দাহিয়া (রা.) মহানবী (সা.)-কে পুরো ঘটনা অবহিত করেন তখন মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে প্রেরণ করেন আর দাহিয়াকেও যায়েদ এর সাথে প্রেরণ করেন। যায়েদ (রা.)'র দলটি অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত আর রাতের বেলা সফর করত আর এভাবে সফর করতে করতে হিসমা'র দিকে অগ্রসর হতে থাকে আর একেবারে প্রভাতকালে বনু জুযাম এর লোকদের গিয়ে ধরে ফেলে। বনু জুযাম মোকাবিলা করে, রীতিমত যুদ্ধ হয়, কিন্তু মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণের সামনে তারা টিকতে পারে নি আর কিছুক্ষণ মোকাবিলা করার পর তারা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। আর যায়েদবিন হারেসা বহু জিনিসপত্র, সম্পদ, গবাদিপশু এবং প্রায় একশত বন্দি সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু যায়েদের মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই বনু জুযাম-এর শাখা বনু যুবায়েব গোত্রের লোকেরা যায়েদের এই অভিযানের খবর পায় আর তারা তাদের নেতা রিফা বিন যায়েদ-এর সাথে মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, (যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই মালপত্র উদ্ধার করেছিল,) আর আমাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের অনুকূলে শান্তিচুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ চুক্তি হয়েছে যে, তারা নিরাপত্তা পাবে। প্রশ্ন হলো আমাদের গোত্রকে কেন আক্রমণ করা হলো? এই আক্রমণে তাদের গোত্রের কিছু লোকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এটি সত্য কথা, কিন্তু যায়েদ এ কথা জানতো না। এছাড়া তখন যারা নিহত হয়েছিল তাদের জন্য মহানবী (সা.) বার বার সমবেদনা প্রকাশ করেন। এতে রিফা-এর সাথি আবু যায়েদ বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যারা নিহত হয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা কোন দাবি করছি না। এটি একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ছিল যা ঘটেছে। অর্থাৎ আমাদের সাথে যাদের চুক্তি আছে তাদেরকেও যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যারা জীবিত আছে আর আমাদের গোত্রের কাছ থেকে যে মালপত্র যায়েদ দখল করেছেন, তা আমাদের হাতে ফেরত আসা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এটি একান্ত সঠিক কথা। আর তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আলীকে যায়েদের কাছে প্রেরণ করেন এবং চিহ্নস্বরূপ তাকে নিজের তরবারি প্রদান করেন এবং যায়েদের কাছে এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, এই গোত্রের যেসব বন্দি এবং মালপত্র তোমার করতলগত হয়েছে বা যে ধনসম্পদই তুমি দখল করেছ তা ছেড়ে দাও। যায়েদ এই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের কাছ থেকে নেওয়া গনিমতের মাল তাদেরকে ফেরত দেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৮১-৬৮২)

অতএব চুক্তি বা সন্ধি পালনের ক্ষেত্রে এই ছিল মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শ। এমন নয় যে, বন্দি করেছেন বলে তাদের ওপর নির্যাতন করতে হবে, বরং ভুল বোঝাবুঝির কারণে যা কিছু হয়েছে, কিছু গোত্র প্রভাবিত হয়ে থাকবে, আর হতে পারে তাদের কতিপয় ইচ্ছাকৃতভাবে অংশ নিয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের মালপত্রও তাদেরকে ফেরত দেন।

এরপর হযরত যায়েদের আরেকটি সারিয়া অভিযান যা ষষ্ঠ হিজরী সনের রজব মাসে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উল্লেখও পাওয়া যায়। হিসমা-র অভিযানের এক মাস পর মহানবী (সা.) পুনরায় যায়েদ বিন হারেসাকে 'ওয়াদিউল কুরা'-য় প্রেরণ করেন। যায়েদের বাহিনী যখন 'ওয়াদিউল কুরা'-য় পৌঁছে তখন বনু ফাযারা গোত্রের লোকেরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। অতএব এই লড়াইয়ে বেশ কিছু মুসলমান শহীদ হন। স্বয়ং যায়েদও আহত হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় তাকে রক্ষা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এই অভিযানে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক যে স্থানের উল্লেখ হয়েছে তা মদিনার উত্তরে সিরিয়া যাওয়ার পথে একটি বসতিপূর্ণ উপত্যকা ছিল যেখানে ছিল অনেকগুলো গ্রামের বসতি। এ কারণেই এর নাম 'ওয়াদিউল কুরা' হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ এমন উপত্যকা যা ছিল বহু গ্রামের আবাসস্থল ।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৬৬২-৬৮৩)

মুতা-র অভিযান অষ্টম হিজরী সনে হয়। মুতা বালকা-র কাছে সিরিয়ায় অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এই অভিযানের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে সাদ লিখেন, মহানবী (সা.) হারেস বিন উমায়েরকে দূত হিসেবে বসরার অধিপতির কাছে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন শারাহবীল বিন আমর গাস্‌সানী তাকে শহীদ করে। হযরত হারেস বিন উমায়ের ব্যতিরেকে মহানবী (সা.) এর আর কোন দূতকে শহীদ করা হয় নি। যাহোক এই মর্মান্তিক ঘটনায় মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সা.) মানুষকে আহ্বান করলে তারা খুব দ্রুত জুরফ নামক স্থানে একত্রিত হয়ে যায়, যাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, সবার আমীর হলেন যায়েদ বিন হারেসা। আর একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদকে দিতে গিয়ে এ নসীহত করেন যে, হারেস বিন উমায়েরকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর। যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, না হলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ হয়।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ:৯৭-৯৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) মুতার যুদ্ধের জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নিযুক্ত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ শহীদ হয়ে গেলে জাফের আমীর হবেন। আর যদি জাফেরও শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তোমাদের আমীর হবেন। এই সেনাবাহিনীকে 'জাইশুল উমারা'-ও বলা হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৬১) (মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫০৫, আলিমুল কিতাব, বেরুত, ১৯৯৮)

সহীহ্ বুখারী এবং মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও এর উল্লেখ রয়েছে। রেওয়ায়েতে এটিও উল্লিখিত আছে যে, হযরত জাফের মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমার কখনো এই ধারণাই হয় নি যে, আপনি যায়েদকে আমার ওপর আমীর নিযুক্ত করবেন। তিনি (সা.) বলেন, এ কথা ছাড়, কেননা তুমি জান না যে, কোনটি উত্তম।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় ভাগ, পৃ:৩৪)

মুতা অভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যা বলেছেন, যদিও এ ঘটনার কিছুটা উল্লেখ আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বা কয়েক মাস পূর্বে খুতবায় করেছিলাম, কিন্তু এখানে যেহেতু যায়েদের প্রেক্ষাপটে কথা হচ্ছে তাই পুনরায় উল্লেখ করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে এই যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়েছিলেন। কিন্তু একইসাথে তিনি (সা.) এটিও বলেছিলেন যে, আমি এখন যায়েদকে এই সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করছি, যায়েদ যদি যুদ্ধে নিহত হন তাহলে তার স্থলে জাফের বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন, আর যদি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: মুত্তাকি এবং স্বচ্ছ হৃদয়ের এমন মানুষ যার মুখের কথা কটু শোনালেও তা সত্য।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তিনিও নিহত হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব দিবেন। আর যদি তিনিও নিহত হন তাহলে মুসলমানরা একমত হয়ে যাকে নির্ধারণ করবে তিনি বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। তিনি (সা.) যখন এই কথা বলেন তখন এক ইহুদীও তাঁর (সা.) কাছে বসে ছিল। সে বলে, আমি যদিও আপনাকে নবী মানি না কিন্তু আপনি সত্য হয়ে থাকলে এই তিন জনের কেউ জীবিত ফিরবে না, কেননা নবীর মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা পূর্ণ হয়ে থাকে। কয়েক মাস পূর্বে এই ঘটনার যা উল্লেখ হয়েছিল সেখানে সম্ভবত এটি বলা হয়েছিল যে, সেই ইহুদী হযরত যায়েদের কাছে যায় এবং তাকে এই কথা বলে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই রেওয়ায়েতকে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তীতে সেই ইহুদী হযরত যায়েদের কাছে যায় এবং তাকে বলে যে, তোমাদের রসূল যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তুমি জীবিত ফিরবে না। হযরত যায়েদ বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসবো কী আসবো না, সেটি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, কিন্তু আমাদের রসূল (সা.) অবশ্যই সত্য রসূল। আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে এই ঘটনা হুবহু এভাবেই পূর্ণ হয়। হযরত যায়েদ শহীদ হন। তার পর হযরত জাফের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও শহীদ হন। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও শহীদ হন। এরপর মুসলিম বাহিনীর মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার উপক্রম হলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের অনুরোধে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা নিজের হাতে নেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং তিনি নিরাপদে সেনবাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন।

(ফারিযায়ে তবলীগ অউর আহমদী খোয়াতীন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৫-৪০৬)

বুখারীতে এই ঘটনার উল্লেখ যেভাবে পাওয়া যায় তাহলো, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা নিজের হাতে নেন এবং শহীদ হন। এরপর জাফের তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তিনিও শাহাদত বরণ করেন। এই সংবাদ দেয়ার সময় মহানবী (সা.) এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বলেন, এরপর খালেদ বিন ওয়ালীদ সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও পতাকা হাতে নেন এবং তিনি বিজয় লাভ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৪৬)

মহানবী (সা.) এর কাছে যখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত জাফের এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি (সা.) তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। হযরত যায়েদের সংবাদের মাধ্যমে তিনি সূচনা করেন। তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্! যায়েদকে মাগফিরাত কর। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! জাফের এবং আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে ক্ষমা কর।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪, দারুল কুতুবল ইলমিয়া)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত জাফের এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা যখন শহীদ হন তখন মহানবী (সা.) মসজিদে বসে পড়েন এবং তাঁর চেহারায় দুঃখ ও কষ্টের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৩১২২)

তাবাকাতুল কুবরায় লেখা আছে যে, হযরত যায়েদের শাহাদতের পর মহানবী (সা.) তার পরিবারের কাছে সমবেদনা জানানোর জন্য যান। তার কন্যার চেহারায় ক্রন্দনের ছাপ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। এতে মহানবী (সা.) এর চোখ থেকেও অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত যায়েদ বিন উবাদা নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) এটি কী? আপনার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে! তিনি (সা.) বলেন 'হাযা শওকুল হাবীবে ইলা হাবীবিন'। অর্থাৎ এটি এক প্রেমিকের তার প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসা।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪, দারুল কুতুবল ইলমিয়া)

হযরত যায়েদের শাহাদতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে সাদ লিখেন, মহানবী (সা.) মুতার অভিযানে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য আমীরদের ওপর তাকে প্রাধান্য দেন। মুসলমান এবং মুশরিকদের যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ হয় তখন মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত আমীরগণ পদাতিক যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করছিলেন। হযরত যায়েদ ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং যুদ্ধ করেন। আর অন্যরাও তার সাথী হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদের জানাযা পড়ান এবং বলেন হযরত যায়েদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা কর, তিনি দৌড়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩-৩৪, দারুল কুতুবল ইলমিয়া)

হযরত ওসামা যিনি হযরত যায়েদ বিন হারেসার পুত্র ছিলেন, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তাকে অর্থাৎ হযরত ওসামাকে ও হাসানকে কোলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্ এদের উভয়কে ভালোবাস কেননা আমি এদের উভয়কে ভালোবাসি।

(সহী আল বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলে আসহাব, হাদীস-৩৭৩৫)

হযরত জাবালা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোন যুদ্ধে না গেলে হযরত আলী অথবা হযরত যায়েদ ছাড়া তিনি নিজের অস্ত্র আর কাউকে দিতেন না।

(কুনযুল আমাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৯৭)

হযরত জাবালা আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) এর কাছে দুটি হওদা তোহফাস্বরূপ দেওয়া হলে তার একটি তিনি (সা.) নিজে রাখেন এবং দ্বিতীয়টি হযরত যায়েদকে দিয়ে দেন।

(কুনযুল আমাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৯৭)

পুনরায় হযরত জাবালারই বর্ণনা, তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে দুটি জুব্বা উপহারস্বরূপ উপস্থাপিত হয়। তিনি (সা.) একটি নিজের জন্য রাখেন এবং দ্বিতীয়টি হযরত যায়েদকে দান করে দেন।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১)

অপর এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে মহানবী (সা.) এর প্রেমিক বলা হতো। হযরত যায়েদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের মাঝ থেকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ যায়েদ। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃ ত করেন আর মহানবী (সা.) মুক্ত করে তাকে পুরস্কৃ ত করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৭)

মুতার যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারাংশ হলো, মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মহানবী (সা.) অনেক বড় একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন আর একাদশ হিজরী সনের সফর মাসে মহনবী (সা.) মানুষকে নির্দেশ প্রদান ক রেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যদিও এই মুতার যুদ্ধের পর যে বাহিনী গঠন করেছিলেন তার সাথে যায়েদ বিন হারেসার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তিনি পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছিলেন, কিন্তু সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতি এবং যু দ্ধের কারণের মাঝে হযরত যায়েদ বিন হারেসার উল্লেখও করা হয়। তাই এ অংশটিও আমি বর্ণনা করছি। সম্ভবত কিছু দিন পূর্বে হযরত ওসামার স্মৃতিচারণের সময়ও এর কিয়দংশ আলোচিত হয়েছিল। যাহোক হযরত ওসামা বদরী সাহাবী ছিলেন না, তখন তিনি অনেক ছোট ছিলেন। তথাপি আমি যেহেতু সাধারণভাবে সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছিলাম তাই তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। যাহোক এই বাহিনী গঠিত হওয়ার পরের দিন মহানবী (সা.) হযরত ওসামা বিন যায়েদকে ডেকে পাঠান এবং এই অভিযানের নেতৃত্ব তার হাতে অর্পণ করে বলেন, তোমার পিতার শাহাদত-স্থ লের দিকে যাও। আরসিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দি য়ে বলেন, রওয়ানা হওয়ার পর তড়িৎগতিতে পথ চল এবং তারা সংবাদ পাওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যাও। এরপর সকাল হতেই সিরিয়ার বালকা অঞ্চলে মুতার নিকটস্থ 'উবনা' নামক স্থানে আক্রমণ কর, যেখানে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল। আর বালকা, যা সিরীয়ায় অবস্থিত একটি অঞ্চল যা দামেস্ক এবং ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, যা সম্পর্কে লিখা রয়েছে যে, হযরত লূতের বংশধর হতে বালেক নামের এক ব্যক্তি এবসতি গড়ে তুলেছিল, এছাড়া দারুম সম্পর্কে লিখা রয়েছে যে, মিশর যাওয়ার পথে ফিলিস্তিনের গাজওয়া নামক স্থানে অবস্থিত একটি জায়গা; যাহোক মহানবী (সা.) বলেন, হযরত যায়েদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসব জায়গাকে নিজের ঘোড়ার পদতলে দলিতমথিত কর। মহানবী (সা.) ওসামাকে আরো বলেন, নিজের সাথে পথ চেনে এমন মানুষ নিয়ে যাও এবং সেখানকার সংবাদ সংগ্রহের জন্যও লোক নিয়োগ কর, যে তোমাকে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সফলতা দান করুন। আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই অভিযানের সময় হযরত ওসামার বয়স ১৭ থেকে ২০ বছরের মাঝামাঝি ছিল। মহানবী (সা.) হযরত ওসামার জন্য স্বহস্তে একটি পতাকা বাঁধেন এবং হযরত ওসামাকে বলেন, আল্লাহ্র নামে তাঁর পথে জিহাদ কর আর যে আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তার সাথে যুদ্ধ কর। হযরত ওসামা এই পতাকা

নিয়ে বের হন এবং সেটিকে হযরত বুরায়দার হাতে তুলে দেন। এই বাহিনী জুর্‌ফ নামক স্থানে একত্রিত হতে থাকে। জুর্‌ফ মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। বলা হয় এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এই বাহিনীতে মুহাজের ও আনসারদের সবাই যোগ দেন। এদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ, হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস-এর মতো মহান ও জ্যেষ্ঠ সাহাবীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তাদের এই বাহিনীর নেতা নির্ধারণ করা হয় হযরত ওসামাকে, যার বয়স ছিল ১৭/১৮ বছর।

কিছু মানুষ হযরত ওসামার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, এই বালককে এত অল্প বয়সে প্রথম সারির মুহাজেরদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন। মহানবী (সা.) তাঁর মাথা একটি রুমাল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তিনি একটি চাদর দিয়ে শরীর আবৃত করে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোক সকল! এটি কেমন কথা, যা তোমাদের কারো কারো পক্ষ থেকে ওসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে আমার কাছে পৌঁছেছে। ওসামাকে আমীর নিযুক্ত করার আমার সিদ্ধান্তে তোমরা যদি আপত্তি করে থাক তাহলে এর পূর্বে তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করার কারণেও তোমরা আপত্তি করেছিলে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! সে-ও অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসা নিজের মাঝে আমীর হওয়ার গুণাবলী লালন করত এবং তার পরে তার ছেলেও নিজের মাঝে আমীর হওয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। সে তাদের অন্তর্গত ছিল যারা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং এরা দুজনই নিশ্চিতভাবে সকল প্রকার কল্যাণ লাভের অধিকার রাখে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, অতএব তার অর্থাৎ ওসামার জন্য কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর, কেননা সে তোমাদের উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। এটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের ২দিন পূর্বের কথা। হযরত ওসামার সাথে যেসব মুসলমান রওয়ানা হচ্ছিলেন, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বিদায় জানিয়ে জুর্‌ফ নামক স্থানে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য চলে যান। মহানবী (সা.)-এর রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় কিন্তু তিনি (সা.) জোরালোভাবে বলেন, ওসামার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দাও। রবিবার রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যথা আরো বেড়ে যায় আর হযরত ওসামা সেনাদলের সাথে ফিরে আসেন, তখন তিনি (সা.) অচেতন অবস্থায় ছিলেন। সেদিন মানুষ তাঁকে ঔষধ পান করিয়েছিল। হযরত ওসামা মাথা নিচু করে মহানবী (সা.)-কে চুমু খান। তিনি (সা.) তখন কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তিনি (সা.) তাঁর দুই হাত আকাশ পানে উঠিয়ে হযরত ওসামার মাথায় রাখেন। হযরত ওসামা বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করছেন। হযরত ওসামা সৈন্য বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন। সোমবারে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থার উন্নতি হয় আর তিনি (সা.) হযরত ওসামাকে বলেন, ঐশী কল্যাণে সুরভিত হয়ে যাত্রা কর। হযরত ওসামা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান এবং মানুষকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে তার মা হযরত উম্মে আয়মানের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এই বার্তা নিয়ে আসে যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে হচ্ছে, অসুস্থতা অনেক বেড়ে যায়। এই দুঃখজনক সংবাদ শোনা মাত্রই হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দার সাথে হযরত ওসামা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন, ফিরে আসেন। তারা দেখেন যে মহানবী (সা.) অন্তিম লগ্ন অতিবাহিত করছেন।

১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্যাস্তের পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন, যে কারণে মুসলিম সৈন্য বাহিনী জুর্‌ফ থেকে মদিনায় ফিরে আসে। হযরত বুরায়দা হযরত ওসামার পতাকাটি মহানবী (সা.)-এর ঘরের দরজায় গেড়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে সবার বয়আত করার পর হযরত আবু বকর হযরত বুরায়দাকে নির্দেশ প্রদান ক রেন যে, পতাকা নিয়ে ওসামার বাড়ি যাও, সে যেন স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন, তা নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়। হযরত বুরায়দা পতাকা নিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বে যে স্থানে সমবেত হয়েছিল সে স্থানে চলে যান। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর পুরো আরবে, সাধারণ হোক বা বিশেষ, প্রায় প্রত্যেক গোত্রেই ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের মাঝে কপটতা প্রকাশ পেয়েছিল। তখন ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল আর একথা ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল যে, এখন দেখি কী হয়? এছাড়া প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যও তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল এবং মুসলমানদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে মুসলমানদের অবস্থা ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত রাতে একটি ছাগলের অবস্থা যেমন হয় তেমনিই ছিল। খুবই কঠিন অবস্থায় ছিল তারা। বড় বড় সাহাবীরা হযরত আবু বকরের সমীপে নিবেদন করেন যে, অবস্থার সংবেদনশীলতার নিরিখে ওসামার সেনাবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করুন, কিছুটা বিলম্বিত করুন, তারা কয়েকদিন পর যাত্রা করুক। তখন হযরত আবু বকর অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যদি বন্যপশুরা আমাকে নিয়ে টানাটানি করে তবুও আমি এই সেনাদলকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হব আর আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই ছাড়বো। অধিকন্তু এই জনপদে আমি যদি একা ও নিসঙ্গও থেকে যাই, তবুও আমি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই ছাড়ব। যাহোক তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর বাস্তবায়ন করেন এবং যেসব সাহাবী ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদেরকে জুর্‌ফে ফিরে গিয়ে পুনরায় ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে পূর্বে ওসামার সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিল আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন কোন অবস্থাতেই পিছনে না থাকে আর না আমি তাকে পশ্চাতে থাকার অনুমতি দিব। তাকে যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয় তাকে অবশ্যই সাথে যেতে হবে। যাহোক সেনাদল পুনরায় প্রস্তুত হয়ে যায়। কতিপয় সাহাবী পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে পুরনরায় পরামর্শ দেয় যে, আপাতত এই সেনাদলকে থামানো হোক। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওসামা হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন যে, আপনি হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে গিয়ে তাকে বলুন তিনি যেন সেনাদলের যাত্রা রহিত করেন যাতে আমরা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি আর রসূলের খলিফা ও রসূলের স্ত্রীদের আর মুসলমানদের'কে মুশরিকদের আক্রমণ থেকে যেন রক্ষা করতে পারি। এছাড়া কতিপয় আনসার সাহাবা হযরত ওমর (রা.)-কে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা হযরত আবু বকর যদি সেনাদল প্রেরণে অনড় থাকেন আর যদি এটাই সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তাঁকে নিবেদন করুন, তিনি যেন এমন কোন ব্যক্তিকে সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করেন যিনি বয়সে ওসামার চেয়ে বড় হবেন। মানুষের এই প্রস্তাব নিয়ে হযরত ওমর যখন হযরত আবু বকরের কাছে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকর পুনরায় সেই লৌহদৃঢ় সংকল্পের সাথে বলেন, যদি জঙ্গলের হিংস্র পশুরা মদিনায় প্রবেশ করে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি সেই কাজ করা থেকে বিরত হব না যে কাজ করার নির্দেশ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদান করেছেন। এরপর হযরত ওমর কতিপয় আনসারের পক্ষ থেকে বার্তা শুনালে সেটি শুনতেই হযরত আবু বকর (রা.) প্রতাপের সাথে বলেন, তাকে অর্থাৎ ওসামাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমীর মনোনীত করেছেন আর তোমরা আমাকে বলছ যে, আমি যেন তাকে এই পদ থেকে সরিয়ে দিই? হযরত আবু বকরের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনে আর তার লৌহদৃঢ় সংকল্প দেখার পর হযরত ওমর সেনাদলের কাছে যান। মানুষ যখন জিজ্ঞেস করে যে, কী হলো? তখন হযরত ওমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। কেবল তোমাদের কারণে আমাকে আজ রসূলের খলীফার কাছে ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে।

যখন হযরত আবু বকরের নির্দেশ অনুযায়ী ওসামার সেনাদল জুর্‌ফ নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন হযরত আবু বকর স্বয়ং সেখানে গিয়ে সেনাদল নিরীক্ষণ করেন এবং এটিকে সুবিন্যস্ত করেন। যাত্রাকালীন দৃশ্যও ছিল অভাবনীয়। সে মুহূর্তে হযরত ওসামা আরোহিত ছিলেন অথচ খলিফাতুর রসূল হযরত আবু বকর পায়ে হাঁটছিলেন। হযরত ওসামা নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! হয় আপনি বাহনে আরোহন করুন নতুবা আমিও নিচে নেমে আসছি। তখন হযরত আবু বকর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমিও বাহন থেকে নামবে না আর আমিও বাহনে চড়ব না আর আমার কী হয়েছে যে, আমি এক মুহূর্তের জন্য আমার পদযুগল আল্লাহ্‌র পথে ধুলিধুসরিত করবো না কেননা গাজী যখন এক পদক্ষেপ নেয় তখন এর প্রতিদানে তার জন্য সাত শত পুণ্য লেখা হয় আর তাকে সাত শতগুণ উচ্চতা

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীম অনুধাবন করা এবং সেই অনুসারে হেদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া আবশ্যিক ও মূল বস্তু।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

দান করা হয় এবং তার সাত শত দোষত্রুটি মু ছে দেওয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মদীনায় বেশ কয়েকটি কাজের জন্য হযরত ওমরের প্রয়োজন ছিল। হযরত আবু বকর তাকে নিজ থেকে আটকানোর পরিবর্তে হযরত ওসামার কাছে অনুমতি প্রার্থনা ক রেন যে, তিনি যদি উত্তম মনে করেন তাহলে হযরত ওমর'কে মদিনায় হযরত আবু বকরের কাছে অবস্থানের অনুমতি দিতে পারেন। হযরত ওসামা যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত ওমরকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন। এই ঘটনার পর যখনই হযরত ওমর ওসামার সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহাল আমীর' অর্থাৎ হে আমীর! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত ওসামা উত্তরে বলতেন, 'গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া আমিরাল মু'মিনিন' অর্থাৎ হে আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।

যাহোক হযরত আবু বকর অবশেষে সেনাদলকে এই বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, চুরি করবে না আর 'মুসলা' করবে না অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোধীদলের যারা মারা যায় অথবা নিহত হয় তাদের মৃতদেহ বিকৃত করবে না। শিশু, বৃদ্ধ আর মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। খেজুর বৃক্ষ কর্তন করবে না এবং পোড়াবেও না। কোন ভেড়া, গরু অথবা উটকে খাবারের উদ্দেশ্য ছাড়া জবাই করবে না। এরপর তিনি বলেন যে, তোমরা অবশ্যই এমন এক জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা নিজেরা গির্জায় ইবাদতে মগ্ন থাকবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু বলবে না। তোমাদের সাথে এমন লোকদেরও সাক্ষাৎ হবে যারা নিজেদের পাত্রে করে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসবে, তোমরা যদি তা থেকে খাও তাহলে বিসমিল্লাহ্ পড়ে খাবে। আর তোমরা অবশ্যই এমন জাতির কাছে পৌঁছবে যারা নিজেদের মধ্য মাথার চুল কামিয়ে রাখবে কিন্তু মাথার চতুর্দিকের চুল ঝুটির ন্যায় ছেড়ে রাখবে। অতএব তোমরা এমন লোকদেরকে তরবারির হালকা আঘাত করো আর আল্লাহ্র নাম নিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে অপমান-লাঞ্ছনা আর প্লেগের মহামারি থেকে নিরাপদ রাখুন। অতঃপর হযরত আবু বকর হযরত ওসামাকে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তার সবকিছু করবে।

এই সমস্ত কথা দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয় যে, যেখানে হযরত আবু বকর হযরত ওসামাকে ইসলামী যুদ্ধের রীতিনীতি মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থাৎ কোন প্রকার অত্যাচার করা যাবে না, সেখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, এই সেনাদলের বিজয়ের বিষয়েও তাঁর সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বলেন যে, তুমি সফলতা লাভ করবে। যাহোক একাদশ হিজরী সনের রবিউল আখের মাসের ১ তারিখে হযরত ওসামা যাত্রা করেন। হযরত ওসামা নিজ সেনাদল সাথে মদিনা থেকে যাত্রা করে অবিরাম পথ অতিক্রম করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওসিয়্যত অনুযায়ী সিরিয়ার উবনা-য় পৌঁছন আর প্রভাত হতেই তিনি সেই এলাকায় চতুর্মুখী হামলা করেন। এই যুদ্ধে যে স্লোগান বা নারাহ্ ছিল তা হলো 'ইয়া মানসূরু আমিদতা' অর্থাৎ হে সাহায্যপুষ্ট! হত্যা করো। এ যুদ্ধে যে-ই মুসলিম মুজাহিদদের সাথে মোকাবিলা করেছে সে নিহত হয়েছে আর অনেককে যুদ্ধবন্দি বানানো হয়েছে, অনুরূপভাবে অনেক গনিমতের মালও হস্তগত হয়েছে যা থেকে তারা এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকিটা সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন আর অশ্বারোহীর অংশ পদাতিকদের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। এই যুদ্ধশেষে সেনাদল একদিন সেখানেই অবস্থান করে আর পরবর্তীদিন মদিনার উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করে।

হযরত ওসামা মদিনার দিকে একজন সুসংবাদদাতা প্রেরণ করেন। এই অভিযানে মুসলমান দের কোন সদস্য শহীদ হয় নি। যখন এই সফল ও বিজয়ী সেনাদল মদীনায় এসে উপস্থিত হয়, তখন হযরত আবু বকর মুহাজের ও আনসারদের সাথে মদীনার বাহিরে গিয়ে তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্বাগত জানান। হযরত বুরায়দা পতাকা দুলিয়ে সেনাবাহিনীর অগ্রে হাঁটছিলেন। সৈন্যবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করে মসজিদে নববী পর্যন্ত যায়। হযরত ওসামা (রা.) মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেন এবং নিজ বাড়িতে চলে যান। বিভিন্ন বর্ণনানুসারে এই বাহিনী ৪০-৭০ দিন পর্যন্ত বাহিরে অবস্থান করার পর মদিনায় ফিরে এসেছিল। ওসামার বাহিনীকে প্রেরণ করা মুসলমানদের জন্য অনেক লাভজনক প্রমাণিত হয়, কেননা আরবরা বলতে থাকে যে, মুসলমানদের মাঝে যদি শক্তি না থাকত, তাহলে তারা কখনোই এই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করত না। এভাবে কাফেররা এমন অনেক কাজ থেকে বিরত হয়ে যায় যা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে করতে চাইছিল।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৪৫-১৪৭)(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৯১-২৯৪) (মুজামিল বালদান, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫৭৯)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও সমর্থনে হযরত ওসামা (রা.) মহানবী (সা.) এর কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন আর ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও আর যুদ্ধে অসাধারণ সফলতার নিরিখেও এই অভিযানকে মহান প্রমাণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেছিলেন, সে সর্বোত্তম নেতা। খোদা তা'লার কৃপা, মহানবী (সা.) ও যুগ খলীফার দোয়ার কবুলিয়্যত এবং কল্যাণ এ কথা সাব্যস্ত করে যে, হযরত ওসামা (রা.)-ও তার শহীদ পিতা হযরত যায়েদ (রা.)-এর মতো শুধুমাত্র নেতৃত্বেরই যোগ্য ছিলেন না, বরং সেসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিশেষ এক মর্যাদা রাখতেন। আর যুগ খলীফার দৃঢ় সংকল্প এবং মনোবলই অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের বিভিন্ন আশঙ্কা ও আপত্তি সত্ত্বেও এই সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করে, আর এরপর খোদা তা'লা এই সৈন্যবাহিনীকে সফলতা এবং বিজয় দানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রথম শিক্ষা এটি দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর এখন সমস্ত বরকত শুধুমাত্র খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই নিহিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও 'সিররুল খিলাফা' পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

(সিররুল খুলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

যাহোক, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তাঁর পুত্র হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর ওপর, যারা আমাদের মনিব এবং অভিভাবক মহানবী (সা.) এর প্রিয়ভাজন ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা হাজারো রহমত এবং কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা হলো মোকাররম সিদ্দিক আদম দাম্বিয়া সাহেবের, যিনি আইভরি কোস্টের মুবাল্লেগ ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। গত বছর তার প্রোস্টেট-এর অপারেশনও হয়েছিল। একইভাবে তার প্লীহারও সমস্যা ছিল এবং ডায়লোসিসও চলছিল। চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ দিন থেকেতিনি আবিজান অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন পূ র্বে হঠাৎ অধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৪ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

সিদ্দিক আদম সাহেব ১৯৫০ সনে আইভরি কোস্টের লোসিঙ্গে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সনের কয়েক বছর পূর্বে বা আনুমানিক ১৯৭৭ সনের কাছাকাছি সময়ে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও ৭ কন্যা এবং ২জন পুত্র সন্তান রয়েছে। অতঃপর ১৯৮১ সালে জীবন উৎসর্গ করার পর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তার দুই

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

ইমামের বাণী

"আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথ সন্ধান করার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ১৭ই মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

বন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হন। আনুমানিক একবছর পর্যন্ত সফরের কষ্ট সহ্য করার পর ১৯৮২ সনে রাবওয়া পৌঁছেন এবং জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৮৫-৮৬ সনে তিনি আইভরি কোস্টে ফিরে যান আর মৃত্যুকাল পর্যন্ত রীতিমত প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেছেন।

তার পাকিস্তান সফরের বিবরণ কিছুটা এমন যে, তিনি বলেন, ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ঘানায় সফর করেন, তখন খলীফাতুল মসীহ্র উপস্থিতি তার হৃদয়ে এমন এক পরিবর্তন সাধন করে যে, তার সম্পূর্ণ চিত্র পাল্টে যায়। আইভরিকোস্টে পৌঁছে তিনি পাসপোর্ট তৈরী করেন এবং বলেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ ক দর্শনের লক্ষ্যে তার এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি পাকিস্তান সফরের জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে মালির এক যুবক আমর মাআয সাহেব, যিনি আজকাল সেখানে আমাদের মুবাল্লেগ,মসজিদ আবিজান-এ আসেন আর নিজের এক স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শহরকে দেখা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্র সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। যাহোক, এভাবে এই তিনজন পাকিস্তান ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ১৯৮১ সনের২০ আগস্ট তারিখেতারা তাদের যাত্রা আরম্ভ করেন। আইভরি কোস্ট থেকে যাত্রা করে প্রথমে ঘানা পৌঁছেন এবং সেখানকার আমীর ওমিশনারী ইনচার্জ ওয়াহাব আদম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দোয়ার পর তারা টোগো থেকে বেনীন অতিক্রম করে নাইজেরিয়ার লেগোস শহরে পৌঁছেন। সেখানকার মিশন হাউসে অবস্থান করার পর ক্যামেরুনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নাইজেরিয়ারমিশনারী ইনচার্জ সাহেবও দোয়ার সাথে তাদের বিদায় জানান এবং কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করেন। অতঃপর ক্যামেরুন অতিক্রম করে তারা চাদ-এ পৌঁছেন। সেখানে তাদেরকে বন্দি অবস্থার কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাহোক, ধৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে সফর অব্যাহত রাখেন। চাদ থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল কিন্তু এক স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তা'লা তাদের এ পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন যে, সৈন্য বাহিনীতে যোগ দাও। সুতরাং তারা লিবিয়ার সৈনিক দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন আর এই পরিস্থিতিতে খোদা তা'লা অদৃশ্য থেকে তাদের সাহায্য করেন আর অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে দেন। এমন এক সময় আসে যখন লিবিয়ার সরকার তাদের সবাইকে দেশান্তরিতকরে দেয়। কিন্তু সকল কারণের আদি কারণ খোদা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, দেশান্তরিত হওয়ার আদেশনামাই শুধু বাতিল হয় নি বরং লিবিয়ার সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করে প্রায় আট মাস তারা লেবাননের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও পালন করেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয়, তখন তিনি তাদের ইনচার্জের কাছে পাকিস্তান যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। এতে তিনি বলেন, আরো কিছুদিন আমাদের কাছে অবস্থান কর, এরপর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বানিয়ে আপনাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিব, অর্থাৎ পাকিস্তান যাওয়ার পরিবর্তে আপনি আমেরিকা চলে যান। এতে তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন আর নিবেদন করেন যে, আমরা শিক্ষা অর্জনের জন্য পাকিস্তান যেতে চাই। যাহোক, পাকিস্তানী দূতাবাস ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু ে খাদা তা'লা তাদের সেনাবাহিনীর ইনচার্জের মাধ্যমে করাচী পর্যন্ত বিমানের টিকিটের ব্যবস্থাকরে দেন, আর এভাবে ২৭ নভেম্বর ১৯৮২ সনে তিনি পাকিস্তান যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে পৌঁছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের দৃষ্টান্ত পুনরায় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়। ইনচার্জ সাহেব এক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন যে, ইনি ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতে পাকিস্তান যাচ্ছেন, তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার অনুরোধ করছি। অতএব সেই পুলিশ কর্মকর্তা তার অনেক সহযোগিতা করে। উড়োজাহাজ রাতে দামেস্ক থেকে রওয়ানা হয়ে সকালে করাচী বিমানবন্দরে এসে পৌঁ ছে। এখন তিনি করাচী পৌঁ ছে গেলেও ভিসার সমস্যা ছিল। দোয়া করার পর ইমিগ্রেশন পুলিশের সামনে পাসপোর্টের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রেখে দেন। প্রশ্নোত্তর হয়। তিনি পাকিস্তানে আসার কারণ হিসাবে শিক্ষা অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তখন পুলিশ কর্মকর্তা সিল মেরে পাসপোর্টে স্বাক্ষর করে দেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করে যে, কোথায় যাবেন? তিনি উত্তরে বলেন, রাবওয়া যাবো। তখন পুলিশ বলে, তুমি কি কাদিয়ানী? তখন অন্য কোন নেতিবাচক চিন্তা-ধারা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার পূর্বে বা সিলমোহরকে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তারই এক সহকর্মী বলে উঠে, কাদিয়ানী হয়েছে তো কী হয়েছে? শিক্ষা অর্জনের জন্য এসেছে তাই তাকে যেতে দাও।

যাহোক, তিনি বলেন, রাবওয়া যাওয়ার এবং খলীফাতুল মসীহ্র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ তার এতই প্রবল ছিল আর এতইআবেগে আপ্লুত ছিলেন যে, তার এই চিন্তা-ই আসে নি যে, এখানে অর্থাৎ করাচীতে খোঁজ নিয়ে দেখি, এখানে জামা'ত থেকে থাকলে কোথায় আছে আর কোন সদস্য থেকে থাকলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে নিই যেন সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়। তিনি জামা'তের সাথে যোগাযোগ করার পরিবর্তে সোজা রেলস্টেশনে পৌঁ ছেন এবং সেখানে রাবওয়া যাওয়ার টিকিট চাইলেন। রেলওয়েতেও টিকিট প্রদানকারী ব্যক্তি লোভী ও বিদ্বেষী লোক ছিল। সে বলে, আহমদীদেরকে আমরা টিকিট দেই না। দুই ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বাকবিতণ্ডার পর অবশেষে দ্বিগুণ ভাড়া নিয়ে টিকিট প্রদানে সম্মত হয়। কিন্তু সে এমন গাড়ির টকিট দিয়েছে যা সবচেয়ে ধীরগতিসম্পন্ন ছিল। আর করাচী থেকে রাবওয়া পৌঁছতে তার চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। যাহোক, খুবই কষ্টসাধ্য সফরের পর তিনি রাবওয়া পৌঁছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে দেখার তার বড় আগ্রহ ছিল। রাবওয়া পৌঁছে তিনি অতিথিশালায় যান। উর্দূ ভাষাতিনি জানতেন না। তিনি জানতেন না যে, ইতোমধ্যে কী হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে বার বার খলীফাতুল মসীহ রাবে বাক্য শুনে তার মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং এরপর যোগাযোগ করার পর জানতে পারেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সা লেসের ইন্তেকাল হয়েছে আর এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে খেলাফতের আসনে আসীন আছেন। যাহোক, এরপর তার সাক্ষাৎ হয়, ১৯৮২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। জামেয়ার অধ্যায়ন সম্পন্ন করে আইভরিকোস্ট ফিরে যান এবং এরপর জামা'তের মাধ্যমে সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে তার নিযুক্তি হতে থাকে। ৮৭ সন থেকে ৯১ সন পর্যন্ত আইভরি কোস্ট, ৯১ থেকে ৯২ নাইজারে, ৯২ থেকে ৯৪ পর্যন্ত বেনিনে, ৯৪ থেকে ৯৬ পর্যন্ত টোগো এবং ৯৬ থেকে আমৃত্যু তিনি আইভরি কোস্টে নিযুক্ত থাকেন।

আইভরিকোস্টের মুবাল্লেগ বাসেত সাহেব লিখেন, সিদ্দীক আদম সাহেব খেলাফতের প্রকৃত প্রেমিক এবং জামাতের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় তার সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি দেখেছেন যে, মরহুম দোয়াগো ও তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন এবং সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতাও বেশ ছিল আর অধিকাংশ সময় নিজ পরিচিতদেরকে তাদের স্বপ্নের অর্থ বা মর্ম বলে দিতেন। নিয়মিত এখানে কেন্দ্রে নি জের মাসিক রিপোর্ট পাঠাতেন আর আমাকে দোয়ার চিঠি-পত্রও লিখতেন। তিনি উর্দূ ভাষায় চিঠি লিখতেন, এটি তার অভ্যাস ছিল। খুবই নেক, সময়ানুবর্তীতার প্রতি সদা সচেতন ছিলেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সর্বদা সময়ানুবর্তিতা মেনে চলতেন আর যে কাজই তার উপর ন্যস্ত করা হতো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘ পথের জামাতি সফরেমোটেও চিন্তিত হতেন না। খুবই হৃদয়গ্রাহীভাবে তবলীগ করতেন। দাজ্জালের ফিতনা, তার আবির্ভাব ও লক্ষণাবলী এবং বর্তমান যুগের নোংরামির কথা উল্লেখ করে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের উল্লেখ করতেন। শ্রোতারা তার বাচন ভঙ্গির জন্যসাধুবাদ না জানিয়ে পারতো না। তিনি লিখেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তবলীগে সফলকাম হয়েছেন। উত্তরাঞ্চলে তার তবলীগি সফরের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'লা হাজার হাজার ফল প্রদান করেছেন। নিজের পাকিস্তান সফর এবং আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার কথা তিনি অনেক উল্লেখ করতেন। আর এটিও বলতেন অর্থাৎ আহদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে এই নিদর্শন উপস্থাপন করতে যে, কিভাবে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতেও আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সুলতানে নাসীর তথা শক্তিশালী সাহায্যকারী দান করেছেন যারা এ পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। আর এরপরআল্লাহ তা'লা তাদেরকে কল্যাণে ভূষিত করেন এবং নিজ মাহদীর সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। সেখানকার ভাষা হলো জুলা,মরহুমের বাচন ভঙ্গি তাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিল। রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানও করতেন আর তার এসব অনুষ্ঠান খুবই উন্নতমানের হতো এবং তিনি খুবই সমাদৃত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততিকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততা দান করুন এবং তাঁর পুণ্যকর্মসমূহকে জারি রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, উকাড়া জেলার মিরাক নিবাসী মিয়া গোলাম মোস্তফা সাহেবের। তিনি ২৪ জুন তারিখে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' । মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন এবং ইবাদতের প্রবল আগ্রহ ছিল, বাজামা'ত নামায আদায়কারী এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন। তিনি তাদের মসজিদে নিজেই ফজরের আযান দিতেন। পুরো পরিবারকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন আর আল্লাহ তা'লা তাকে শেষমূহুর্ত পর্যন্ত রমজানের রোযা রাখার তৌফিক দিয়েছেন। তবলীগ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল, যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, কোন না কোনভাবে তার কাছে তিনি জামা'তের বাণী পৌঁ ছে দিতেন। খুবই

কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, তিনি হলেন শান্তির মূর্তপ্রতীক।

বাল্টিমোর কাউনটি পুলিস বিভাগের ক্রিস কেইল সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: আজকের অনুষ্ঠান ভীষণ সুন্দর ছিল। আমি ২০১৫ সাল থেকে জামাত আহমদীয়াকে দেখে আসছি, এরা বিরামহীনভাবে ভালবাসা ও শান্তির প্রচার করে চলেছে। আজ প্রথম আপনাদের ইমামের মুখেও সেই একই কথা শুনলাম যা থেকে আমি অনুমান করলাম আপনাদের প্রকৃত বাণীর উৎস কোথায়। আপনাদের ইমামের মহান ব্যক্তিত্ব থেকেই এই পুণ্যের উৎসরণ আর সর্বত্র নীচুস্তর পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে যা তাদের কর্মের মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়। আপনাদের এখানে এসে অনেক উপকার হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এখানকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। শান্তি স্থাপনকারী সংগঠনগুলিকে কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষ থেকে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তাই এমন মহান ব্যক্তির এখানে এসে শান্তির বার্তা দেওয়া এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা সত্যিই আনন্দের বিষয়। হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল তাঁর বিনয়।

একজন অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠানে আসার পূর্বেও হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমার তাঁর মধ্যে বিনয় লক্ষ্য করেছি। সভাগৃহে প্রবেশমাত্রই তাঁর প্রতাপময় ব্যক্তিত্ব অনুভব করা গেছে। তিনি প্রত্যেকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে মনে হল তিনিই মানবতার প্রকৃত সহমর্মী।

এক মহিলা নিজের আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করে বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারের থেকে কাছে ছিলাম না, পর্দায় তাঁকে প্রথম বার দেখলাম। তাঁকে দেখেই যেন মনে হল তাঁর সত্তা থেকে খোদার জ্যোতি উৎসারিত হচ্ছে। আমি অনেককেই এমন মন্তব্য করতে শুনেছি আর আমি এখন নিজেই এর সাক্ষী। তাঁর উপস্থিতিতে আমি খোদার জ্যোতি অবতীর্ণ হতে দেখেছি।

মি.চাক হার্ট (বাল্টিমোর কাউন্টির একজন শল্যচিকিৎসক) নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জামাত আহমদীয়ার খলীফার ভাষণ দলিল-প্রমাণে সমৃদ্ধ। এটি এক শক্তিশালী ভাষণ ছিল যাতে তিনি একতা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খলীফা সেই সমস্ত আপত্তিসমূহ এবং ভ্রান্তধারণারও উত্তর দিয়েছেন যা আজকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছড়ানো হচ্ছে। খলীফার বক্তব্য শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাস্তবে জ্ঞানই হল প্রকৃত শক্তি যার দ্বারা অজ্ঞতা দূরীভুত হয়।

মিসেস মারি মারুক্কি সাহেবা বলেন: আমি আপনাদের জামাতের শিক্ষা বিভাগের জন্য সাম্মানিক পদক প্রস্তুত করে থাকি। কাজেই জামাতের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচিতি আছে। খলীফাতুল মসীহকে এম.টি.এর মাধ্যমে পূর্বেই দেখেছিলাম,কিন্তু আজ প্রথমবার সামনে থেকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হুযুর তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে বার্তা আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তা অতীব সুন্দর আর এই সংকটপূর্ণ সময়ের জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

মি. রাস এডওয়ার্ড সাহেব (গভর্ণমন্টে আইটি কনট্রাক্টর) বলেন: আমি আজ প্রথম জামাত আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। আপনাদের খলীফার বাণী খুব ভাল লেগেছে যাতে তিনি অ-মুসলিম সদস্যদের আশ্বস্ত করে বলেছেন যে,জামাত আহমদীয়ার এই মসজিদ শহরে শান্তিনীড় হিসেবে প্রমাণিত হবে।

মিসেস গ্রেস বায়ারলি সাহেব বলেন: আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ত্রিশ বছর মুসলমান এবং ইহুদীদের সঙ্গে কাজ করেছি। আজ ইসলামের খলীফাকে দেখে এবং তাঁর ভাষণ শুনে মনে হল যেন আমাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কোন ধর্মগুরু পোপ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষন দান করছেন। খলীফার ভাষণ শুনে মনে হচ্ছিল যেন তিনি অন্ধকারের আবরণ বিদীর্ণ করছেন। আমি আশা করি, মানুষ খলীফার কথা শুনে অজ্ঞতা ত্যাগ করে জ্যোতির এই নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

মিস এ্যান এইচ পি সাহেবা পেশায় একজন সেবিকা (নার্স)। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আপনাদের খলীফার ভাষণ শোনার পূর্বে আমি ইন্টারনেটে তাঁর প্রোফাইল পড়েছিলাম। আমি আনন্দিত যে, ইন্টারনেটে যেমনটি খলীফা সাহেবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পড়েছিলাম, তিনি ঠিক তেমনই নম্র ও সৌন্দর্যময় চরিত্রের অধিকারী। খলীফা সাহেবের ভাষণ ছিল সহজবোধ্য ও হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী। তিনি নিজের ভাষণের মাধ্যমে যে বার্তা আমাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন, সেগুলির উপর আমলা করা হলে, আমাদের শহরে, মোহাল্লায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মি. বিল মিলেন বলেন: আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। খলীফার ভাষণ খুব ভাল লেগেছে। আপনারা ধর্মীয় বিষয়ে উন্মুক্ত হৃদয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এছাড়া খলীফা সাহেব তাঁর ভাষণে সেই সমস্ত সমস্যাবলীরও উল্লেখ করেছেন যেগুলি আজকের মুসলিম বিশ্ব মুখোমুখি হচ্ছে। ভাষণের শেষে খলীফা সাহেব বার্তা দিয়েছেন যে আমাদের সকলে মিলে নিজেদের কর্মপন্থা এবং দোয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এই বাণীর উপরই এখন আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যত টিকে আছে।

মিস এলেন ক্রাফোর্ড সাহেবা (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা) বলেন: খলীফা দেখে আমি পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মতই তাঁর বার্তাও নিষ্ঠাপূর্ণ। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের সকলের জন্য নমুনা। যে বিষয়টি আমাকে আহত করেছে তা হল খলীফা অমুসলিমদেরকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করতে বাধ্য হলেন যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম আর ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি এও আশা করি যে, হুযুর অবশ্যই এ সম্পর্কে অবগত আছেন যে আমাদের অধিকাংশই ইসলামকে শান্তিপূর্ণ ধর্ম মনে করে।

মিস কারোল রাইস সাহেবা বলেন: আজ ইসলামের খলীফার ভাষণ শুনে এবং তাঁকে দেখে নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে এই ভেবে যে খোদার এক প্রিয়ভাজন আমাদের সামনে ভাষণ প্রদান করছেন, যিনি কেবল শান্তির শিক্ষাই দিয়ে থাকেন।

মিস মেরি এলেন ওয়ানী সাহেবা বলেন: আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে একথা স্পষ্ট হল যে, বাস্তবে ইসলাম এর নামের মতই শান্তিপ্রিয় ধর্ম। ইসলামের খলীফা যে ভঙ্গিতে ভাষণ দেন এবং মানুষের সঙ্গে আলাপ করেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি একজন অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ। তাঁর কথা অন্তরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আমি আশা করি আমাদের বাল্টি মোরে বায়তুস সামাদ মসজিদের মাধ্যমে শান্তি ও আশার নতুন আলো জন্ম নিবে।

মিস বারবারা বম সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: আমি আপানাদের মসজিদের এসেছি। অসাধারণ সুন্দর একটি মসজিদ এটি। আপনাদের খলীফা শহরের মানুষের উদ্দেশ্যে যে বার্তা দিয়েছেন তা এক কথায় অসাধারণ। মুসলমানদের যে কদর্য ভাবমূর্তি সমাজে প্রচার করা হয়েছে নিজের ভাষণে সুন্দরভাবে তিনি সেগুলির উত্তর দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করি তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবী এমন এক পরিবারের সদৃশ হয়ে উঠবে যেখানে আমরা প্রত্যেকে সমান।

রাব্বি এন্ড্রিও বুশ সাহেব বলেন: জামাত আহমদীয়ার খলীফার ব্যক্তিত্বে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও সম্ভ্রমের মিলন ঘটেছে যা মানুষকে মূহুর্তে বিমোহিত করে তোলে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে সমীহ করি।

গোয়েতোমালা জামাতের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত

এক নবদীক্ষিত আহমদী যুবক হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে ভালভাবে নামায পড়ার উপায় কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নামায পড়ার সময় এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যে আপনি খোদার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর তিনি আপনাকে দেখছেন। অতএব বিনয়সহকারে নামাযের জন্য দাঁড়াবেন আর যা কিছু মুখে উচ্চারণ করেন সেগুলির অর্থ জেনে নিন। সুরা ফাতিহা মুখস্ত করুন। 'ইইয়াকা নাবুদ ওয়া ইইয়াকা নাসতাঈন' বার বার পড়ুন। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন নামায পড়ার সময় মনে করবে তোমরা যেন খোদাকে দেখছ বা অন্ততপক্ষে খোদা তোমাদেরকে দেখছেন। যখন এমন ধারণা সৃষ্টি হবে যে খোদা আমাকে দেখছেন তখন বিনয়ও সৃষ্টি হবে আর নামাযের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হবে।

এক নবদীক্ষিত আহমদী হুযুর আনোয়ারকে বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যখন পুত্র কিম্বা কন্যা-সন্তান দান করেন, তখন তাদের জন্য কোন্ ইসলামী নামে নামকরণ করা উচিত। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, যে ইসলামী নাম পছন্দ হয় সেটিই রেখে দিন। যদি মুহাম্মদ নাম রাখতে চান তবে সেটিই রাখুন। মূল বিষয় হল এই দোয়া করা উচিত যে, খোদা তা'লা যেন পুণ্যবান সন্তান দান করেন, যে খোদার অধিকার এবং এবং মানুষের

যুগ খলীফার বাণী

আমার আশঙ্কা হয় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরও একটি বিশ্ব যুদ্ধ ডেকে আনবে।

(ব্রিটেন পার্লামেন্ট হাউস অব কমনসে ভাষণ, ২২ শে অক্টোবর, ২০০৮ সাল)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

অধিকার প্রদানকারী হবে।

এক ছাত্র হুযুর আনোয়ারের নিকট জামেয়া আহমদীয়া কানাডা কিম্বা যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন: যদি মুরুব্বী হতে চাও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাক। আর যেতে হলে কানাডার জামেয়ায় যাও। সেখানকার জামেয়াকে যথারীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই তুমি কানাডা যেতে পার। কিন্তু যুক্তরাজ্য যেতে পার না। যুক্তরাজ্যের জামেয়া এখনও সেই মর্যাদা লাভ করে নি। কানাডা কিম্বা ঘানা, তোমার কাছে এই দুটি বিকল্প রয়েছে।

এক নবদীক্ষিত আহমদী প্রশ্ন করেন যে, একজন ভাল মুসলমান হতে গেলে কোন কোন গুণ থাকা আবশ্যক। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের থেকে সম্ভব হলেও আপনি খোদা তা'লার দৃষ্টি থেকে কোন কর্ম গোপন রাখতে পারবেন না। তাই যখনই কোন কাজ করবেন, একথা স্মরণে রাখবেন যে খোদা তা'লার দৃষ্টি আপনার উপর রয়েছে। খোদা তা'লার মৌলিক আদেশাবলী পালন করুন, তাঁর ইবাদত করুন, উন্নত চরিত্র অবলম্বন করুন এবং মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতি যত্নবান হন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মুসলমান সেই ব্যক্তিই যার হাত ও মুখ থেক অন্যরা নিরাপদ থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন: একবার হযরত মসীহ মওউদ(আ.) কে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, একজন আদর্শ আহমদী হওয়ার জন্য কি কি করণীয় বা কি কি বর্জনীয়? এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন: খোদা তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা তোমাকেও বলে দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,'খোদা তা'লাকে ভয় কর, আর সব কিছু কর।' হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে ভয় করবে সে অনুচিত করতে পারে না। পরিণামে সে একজন উন্নত মুসলমানে পরিণত হয়। হুযুর তাকে উপদেশ হিসেবে বলেন, 'জামেয়াতে নিজের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দাও, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন কর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত বাজামাত পড় । ফজরের পূর্বে নিয়মিত দুই রাকাত নফল নামায পড়ার স্থায়ী অভ্যাস তৈরী কর। উর্দু ভাষা শেখার জন্য জামাতের কোন পত্রিকা থেকে এক পৃষ্ঠা করে প্রতিদিন পড়। দৈনিক আল-ফযল পত্রিকা থেকে একটি করে অনুচ্ছেদ পড়তে পার। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর মধ্যে যেগুলি সহজবোধ্য ভাষায় রয়েছে সেগুলি পড়তে পার। প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে মালফুযাত থেকে এক পৃষ্ঠা করে পড়।

গোয়েতামালার এক নবদীক্ষিত আহমদী নিজের জন্য দোয়ার আবেদন করে বলেন: আমাদের সাহায্য করুন, আমরা অন্ধকারে পড়ে আছি,খোদা যেন আমাদের হেদায়াত দান করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে হেদায়াত দান করেছেন, তিনি আপনাকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। এখন এই বাণীকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনার কর্তব্য। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ কর তা অপরের জন্যও পছন্দ কর। আপনি নিজের জন্য ইসলাম পছন্দ করেছেন, এখন আহমদীয়াতের এই বাণী অন্যদের কাছেও পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এই কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন।

এক নবদীক্ষিতা আহমদী বলেন: হুযুর আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসকরা আসেন আর জামাতের পক্ষ থেকে চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়,স্কুলও খোলা হয়েছে-এখানে এগুলির ভীষণ প্রয়োজন।' একথা শুনে গোয়েতামালার আমীর সাহেব বলেন: যুক্তরাষ্ট্রের হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে 'মসরূর স্কুল' চলছে।' হুযুর আনোয়ার বলেন: স্কুল চালু রাখুন। এটি আমাদের সেবামূলক কাজ। আমাদের জন্য যেখানে সম্ভব হয় এই সেবাটুকু করে থাকি। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে বহু অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতেন আর তাদের ওষুধ দিতেন। অভাবপীড়িতা মহিলারা দল বেঁধে কাদিয়ান আসত। তিনি তাদের সকলের চিকিৎসা করতেন। কোনও এক ব্যক্তি হযরত আকদস (আ.) কে জিজ্ঞাসা করে যে, এভাবে আপনার তো মানুষের জন্য অনেক সময় অপচয় হয়। এর উত্তরে হুযুর (আ.) বলেন, এরা অভাবপীড়িত মানুষ। এখানে চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। কাছাকাছি কোথাও কোন দাওয়াখানা নেই। এজন্যই আমি ওষুধ কিনে রাখি যা তাদের চিকিৎসার কাজে লেগে যায়। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই একই কাজ আমাদেরকেও অব্যাহত রাখতে হবে। আর সর্বত্র আমরা একাজ করে আসছি। আমরা আরও স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী করব।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমাদের

লঙ্গর খানা (দারুল যিয়াফত) একজন পরিচারিকা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কাদিয়ানের লঙ্গর খানা দারুল যিয়াফতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে একজন পরিচারিকা (লেডি কেয়ার টেকার) নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। পরিচারিকার কাজ হবে লঙ্গর খানায় অতিথিনীদের চেকিং করা, আপ্যায়ন করা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের কামরা ঠিক করে দেওয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১০ ঘন্টা ডিউটি দিতে হবে। যে দিনগুলিতে অতিথিদের আগমণ অধিক হয় সেই দিনগুলিতে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ডিউটিতে উপস্থিত থাকতে হতে পারে। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) প্রত্যাশীর বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হবে। জন্ম শংসাপত্র উপস্থাপন করা আবশ্যক। ২) প্রত্যাশীকে অবশ্যই বিবাহিতা হতে হবে। ৩) একমাত্র ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকেই নির্বাচন করা হবে। ৪) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৫) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৭)আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠান। এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে যে আবেদন পত্রগুলি আসবে, কেবল সেগুলিই গ্রাহ্য হবে। ৮) সেবাদানে আগ্রহী মহিলারা নিজেদের স্বামী/পিতা/অভিভাবকের সত্যায়িত স্বাক্ষর সহ নির্দিষ্ট ফর্মটি পুরণ করে লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সদর সাহেবার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকলা ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@ gmail.com

Office: 01872-501130

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

কাদিয়ান দারুল আমান-এ বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের দিনক্ষণ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ভারতের অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ) জাতীয় বাৎসরিক ইজতেমার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। হুযুর কর্তৃক অনুমোদিত ইজতেমার দিনগুলি হল ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর (শুক্র, শনি ও রবিবার)

সমস্ত অঙ্গ সংগঠনগুলির সদস্য, সদস্যা কাদিয়ান দারুল আমানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। এই ইজতেমা তরবীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

২ য় পাতার পর শেষাংশ.....

এমন পরিস্থিতিতেও যদি একজন মুসলিম নিজের ধর্ম এবং নবী করীম (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান প্রকাশ না করে, তবে তার চায়তে অত্যাচারী আর কে হবে?

তোমরা যদি নিজেদের সন্তানদেরকে খৃষ্টান,আর্য ও অন্যদের সঙ্গ সহচর্য থেকে বিরত রাখ না বা বিরত রাখতে না চাও, তবে এর দ্বারা নিজের উপরই নয় বরং সমগ্র জাতির উপর, ইসলামের উপর ভয়ানক অত্যাচার করছ। এর অর্থ এই দাঁড়ায় ইসলামের আত্মাভিমান নিয়ে তোমাদের কোন শিরপীড়া নেই। নবী করীম (সা.)–এর প্রতি তোমাদের মনে কোনও সম্মান অবশিষ্ট নেই।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮-৬১)

ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি বড়ই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী যে শত্রুকে পুণ্যের দ্বারা লজ্জিত করে।' (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশিদ, লন্ডন (২য় পর্ব)

আল্লাহ তা'লা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ঐশী আদেশ শুনে কখনও সে এতটাই প্রভাবিত হয় যার ফলে তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন আসে। হযরত উমর (রা.)-এর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, কুরআন করীমের আয়াত শুনে ততক্ষণাৎ তার প্রভাবের অধীনে দাঁড়িয়ে পড়তেন। হযরত আবু বাকার (রা.)-এর মুখ থেকে কুরআন করীমের এই আয়াত শুনে তাঁর উপর এক অলৌকিক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(আলে ইমরান: ১৪৫) যার ফলে তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছিল এমনকি তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। কখনো এমনও হয়েছে যে নবী (সা.)-এর আদেশ শুনে জীবনে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। পথ চলতে চলতে সহাবীদের কানে রসুলুল্লাহ্ (সা.-)-এর আদেশ এসে পৌঁছায় যে বসে পড়। এই আদেশ যদিও তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় নি, কিন্তু তারা সেখানেই বসে পড়েছেন। সেই সময় মদ বহুল প্রচলিত পানীয় ছিল। একদিন যেই শোনা গেল যে আজ থেকে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নেশায় ডুবে থাকা সত্বেও একজন সাহাবী উঠে গিয়ে লাঠি দিয়ে মদের হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেললেন। বস্তুতঃ পুণ্যের সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যের এই মান প্রত্যেক মোমিনের অর্জন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যেই তরবীয়ত মূলক বক্তৃতাসমূহে কুরআনের আয়াত, রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী বর্ণনা করা হয় যাতে এগুলির কল্যাণে মোমিনদের হৃদয়ে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পুণ্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর কখনও এমন হয় যে, মানুষ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাবিত হয় এবং পুণ্যময় প্রভাবকে গ্রহণ করে।

মানুষ সহজাতভাবেই দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী। অপরের সৎ নমুনা দেখে তার মনেও পুণ্য সম্পাদনের বাসনা জেগে ওঠে এবং সেও সেই রঙে রঙীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রসুলে করীম (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই পরম ভাগ্যবান যে অপরের পুণ্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে। "কারো মনে যদি আমার কথা কোন প্রভাব ফেলে" -এই প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির আলোকে এই দোয়া ও প্রত্যাশা নিয়ে যে, আর্থিক কুরবানীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

প্রথম যুগের দৃষ্টান্তাবলীঃ

আসুন শুরু করি সম্মানীয় সাহাবাগণের দৃষ্টান্ত দিয়ে যারা মহানবী (সা.)-এর জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। এবং সেই সাহাবাগণ এমনভাবে রসুল করীম (সা.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের জীবনের অংশ করে তুলেছিলেন যে, তাঁরা সকলে হিদায়াতের আকাশে নক্ষত্রের মত চির উদ্ভাসিত রয়েছেন। এরাই সেই সৌভাগ্যবান সাহাবা যাঁরা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন এবং তাঁরাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, মহানবী (সা.) যাঁদের দৃষ্টান্তকে চিরকালের জন্য অনুসরণ যোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামের ইতিহাস 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'-এর ইতিহাসে পরিপূর্ণ। সাহাবা কেরাম (সা.) এই ইসলামী শিক্ষাকে যেভাবে মনে-প্রাণে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। হযরত উমর (রা.) একবার এক যুদ্ধের সময় নিজের অর্ধেক সম্পদ উপস্থাপন করেন এবং মনে করেন আমি এক্ষেত্রে সকলের থেকে এগিয়ে রয়েছি। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বাকার (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে নিবেদন করেন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতা করার এই অনুপ্রেরণা সাহাবাগণ মহানবী (সা.)-এর কাছে পেয়েছিলেন। তিনি(সা.)-ই তাঁদের অন্তরের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই হৃদয়সমূহের মধ্যে কুরবানীর বীজ বপন করেছিলেন। এই বীজ যখন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠত মহানবী (সা.)-এর চেহারা আনন্দে ঝলসে উঠত, যেভাবে একজন কৃষক নিজের শস্য-শ্যামল ক্ষেত দেখে আনন্দে আত্মহারা ওঠে। এর একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

হযরত জারীর (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে এক অভাবগ্রস্ত জাতির কিছু মানুষ উপস্থিত হয় যারা অন্নহীন ও বস্ত্রহীন ছিল। তাদের অবস্থা দেখে মহানবী (সা.)-এর চেহারার রঙ পাল্টে যায়। তিনি সাহাবাগণকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন এবং এই সকল মানুষকে সদকা-খায়রাত করার আহ্বান জানান। সাহাবাগণ দিনার, দিরহাম, বস্ত্র, যব, খেজুর সদকা হিসেবে দিলেন। এরফলে বস্ত্রাদি ও ফসলের একটি স্তুপ তৈরী হয়ে যায়। হযরত জারীর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম এই দৃশ্য দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারা সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে হয়ে উঠল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর। (আলে ইমরান: ৯৩)

কুরআন মজীদের এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর নিষ্ঠাবান সাহাবাগণের আচরণ দেখার মত ছিল। এমন মনে হত যেন তারা নিজেদের প্রত্যেক প্রিয় বস্তুকে খোদা তা'লার পথে কুরবান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মদিনার আনসারদের মধ্যে সব থেকে বেশি বাগান ছিল হযরত তালহা (রা.)-এর কাছে। বাইর হা নামে একটি বাগান তাঁর সব থেকে প্রিয় ছিল। এটি মসজিদের নবুবীর সামনে ছিল। মহানবী (সা.) প্রায় সেখানে যেতেন। এই বাগানের ঠান্ডা এবং সুমিষ্ট পানি তাঁর ভীষণ প্রিয় ছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বাগানটি সদকা হিসেবে দান করে দেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমার সম্পদের মধ্যে প্রিয়তম সম্পদ কোনটি? রোম দেশীয় দাসীটির থেকে প্রিয় সম্পদ আমার আর কিছুই ছিল না। ফলে আমি ততক্ষণাৎ সেই দাসিকে মুক্তি দিলাম।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৫৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর ঘটনাও বড়ই ঈমান উদ্দীপক যা তাঁর অকৃত্রিম আবেগের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাছ খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে। লোকেরা খুব কষ্টে একটি মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসে। রান্না করে তাঁর সামনে রাখা হয়। মুখে একটি গ্রাসও যায় নি, এমন সময় দরজায় এক মিসকীন ডেকে ওঠে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাছটি সেই মিসকীনকে দিয়ে দেন। লোকেরা তাঁকে মাছটি খেয়ে নেওয়ার জন্য জোর করে এবং বলে, এই মিসকিনকে আমরা অর্থকড়ি দিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে সে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। কিন্তু হযরত উমর বললেন, এখন আমার কাছে এই মাছটিই সব থেকে প্রিয় বস্তু এবং আমি এটিকে সদকা করব।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৯৭)

হযরত সালমান ফারসি (রা.) শহরের গভর্নর ছিলেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে পাঁচ হাজার দিনার বেতন হিসেবে পেতেন। তিনি এই সমস্ত অর্থই খোদা তা'লার পথে কুরবান করে দিতেন এবং মাদুর বুনে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

(আল-ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবেইর (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আসমা (রা.)-এর থেকে বেশি দানশীলা কাউকে দেখিনি। দুজনের কুরবানী করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) অল্প অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করতেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চিত হলেই তা বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) কখনও কোন জিনিস নিজের কাছে রাখতেনই না।

(আল আদাবুল মুফরদ)

একবার রসুলে করীম (সা.) মহিলাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করার জন্য নসীহত করেন। তিনি (সা.) তখনও বাড়ি পৌছাননি, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী এসে নিবেদন করেন যে, আমার কাছে যা কিছু অলঙ্কারাদি রয়েছে তা সব নিয়ে এসেছি এবং খোদার পথে উৎসর্গ করছি।

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই কয়েকটি উদাহরণ নমুনা হিসেবে দেওয়া হল। বস্তুতঃ রসুলে করীম (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টি সেই সকল সাহাবাদের উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে তারা আত্মবিলীনতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হওয়া এবং তাঁর পথে কুরবানী করার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যার তুলনা পাওয়া যায় না।

বর্তমান যুগের উদাহরণ:

এই শেষ যুগে অর্থাৎ রসুলে করীম (সা.) এর প্রাণদাস এবং একনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আমরা সেই যুগ পেয়েছি যার পথ চেয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ প্রথম যুগের সাহাবাগণের এমনভাবে পদাঙ্ক এমন করেছেন যে, তাদের প্রিয় ইমাম তাদের জীবদ্দশাতেই এই সুসংবাদ শুনিয়েছেন,

"ধন্য সে যে এখন ঈমান এনেছে, তারা আমাকে পাওয়ার মাধ্যমে সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।"

এই সকল সাহাবাগণ এবং তাবেঈনগণের উদাহরণ খুব পুরানো ঘটনা নয়। সেই সমস্ত সৌভাগ্যবানদেরকে দেখার সৌভাগ্য

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 1 Aug, 2019 Issue No.31

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমাদের অনেকের হয়েছে এবং অনেক তাবেঈন এমন রয়েছেন যারা আজকে আমাদের মধ্যে জীবিত রয়েছেন এবং নিজেদের দেখা সাহাবাগণের রঙে রঙীন হয়ে আছেন। আসুন দেখি, ইসলামের জন্য এই আত্ম-উৎসর্গকারীদের আর্থিক কুরবানীর নমুনা কোন পর্যায়ের ছিল।

খোদার পথে ব্যয় করা এক বিষয়, কিন্তু এমনটি করার ক্ষেত্রে অপার উন্মাদনা এবং পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার উদগ্র বাসনাও যদি যুক্ত হয় তবে এমন কুরবানী আকাশের অসীমত্বকেও স্পর্শ করে। একেবারেই গোড়ার দিকের ঘটনা এটি, একটি ইশতেহার প্রকাশ করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ষাট টাকার প্রয়োজন ছিল। তিনি হযরত মুনশী যাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী (রা.)কে বলেন, এটি খুবই জরুরী। আপনার জামাত কি এই প্রয়োজন মেটাতে পারে? হযরত মুনশী সাহেব, সম্মতি জানান। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনে ততক্ষণাৎ বাড়ি যান। স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে অলঙ্কারাদি বিক্রি করে কালক্ষেপ না করেই প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে হুযুর (আ.)কে পেশ করেন। কিছু দিন পর হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব সাক্ষাতের জন্য আসেন। হুযুর (আ.) কপুরথলা জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, আপনার জামাতের মানুষ যথা সময়ে সাহায্য করেছে। এরফলে আসল কথা বেরিয়ে পড়ে যে, মুনশি যাফর আহমদ সাহেব তো জামাতের কোন সদস্যের কাছে এ বিষয়ের উল্লেখই করেন নি। কত অসাধারণ বিনম্রতা এবং নিঃস্বার্থতার চিত্র এই ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠে।

বর্ণনা করা হয় যে, হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব আর্থিক কুরবানীর এমন অনন্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এত বেশি আক্ষেপ করছিলেন যে, তিনি হযরত মুনশী যাফর আহমদ সাহেবের প্রতি দীর্ঘদিন অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অসন্তুষ্টি নিজের মধ্যে কিরূপ মহিমা অন্তর্নিহিত রেখেছে সেকথা তিনিই জানেন। কারণ কেবল এতটুকু ছিল যে, সমস্ত পুণ্য তিনি একাই নিয়ে নিলেন, আমাদেরকে পুণ্যের অংশীদার হতে দিলেন না!

(ক্রমশঃ)

রিপোর্টের শেষাংশ.....

দেশের আসার জন্য আমি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজ আমার ছেলে সঙ্গে আসতে পারে নি। কাজ থেকে ছুটি পাই নি। সে কম্পিউটার সাইন্সের কোর্স সম্পূর্ণ করেছে। আমার ইচ্ছা, সেও জামেয়াতে ভর্তি হোক। হুযুর আনোয়ার ভদ্রমহিলাকে একটি কলম উপহার দিয়ে বলেন, এটি ছেলেকে দিবে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে কোন উপদেশ দিন। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) মহিলাদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। মহিলারা প্রথমত গর্ভাবস্থায় কষ্ট সহ্য করে। এরপর সন্তান প্রসবও অত্যন্ত কষ্টের সময়। অতঃপর শিশুর জন্মের পর তাদের প্রতিপালন করার সময় তাদেরকে নানান বিপদাপদ এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়।কাজেই মায়ের সেবা করা সন্তানের কর্তব্য। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্য সন্তানদের মায়ের সেবা করা উচিত। সন্তানের জন্মের পর তার সব থেকে বেশি সেবাযত্ন করে তার মা। এই কারণে মাকে এই মর্যদা প্রদনা করা হয়েছে আর সন্তানদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন মায়েদের সেবা করে যাতে জান্নাত লাভ করতে পারে। অপরদিকে মায়ের উপর এই দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে যে, তোমাদের পায়ের নীচে জান্নাত তখনই তৈরী হতে পারে যখন তোমরা সঠিক অর্থে সন্তানের লালন পালন করবে। মায়ের সব থেকে বড় দায়িত্ব হল সন্তানের লালন পালন ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং মন্দ পরিবেশ থেকে রক্ষা করা। (ক্রমশ....)

যুগ খলীফার বাণী

অসৎকর্মশীলদের প্রতি পুণ্য করাই আমাদের ধর্ম।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

মিশুক, পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। জুমুআর খুতবা নিয়মিত শুনতেন এবং সন্তানদেরও এ বিষয়ে নসীহত করতেন। কেন্দ্রীয় অতিথি দের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীতে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। তৃষ্ণার্তদের জন্য থারপার্কারে কূপ স্থাপনেরও তৌফিক পেয়েছেন তিনি। ওসীয়্যতের হিসাব নিজ জীবদ্দশাতেই পরিশোধ করে রেখেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে নিজের গৃহও জামা'তকে দান করারসৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং নিজে একটি ছোট কক্ষে অর্থাৎ মসজিদে থাকতে থাকেন। আর এই বাড়িটি এখন মুরব্বী কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মরহুম মূসী ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। মরহুম বুরুন্ডিরমুরব্বী গোলাম মুর্তজাসাহেবেরপিতা ছিলেন, যিনি এখন কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এবং তার মায়ের যখন মৃত্যু হয়েছিল তখন মায়ের জানাযায়ও তিনি যেতে পারেন নি। গোলাম মুর্তজা সাহেব খুবই ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে এই উভয় বিয়োগব্যাথাকে সহ্য করেছেন। আল্লাহ তা'লা তার ধৈর্য ও মনোবল বৃদ্ধি করুন এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব পাল নের তৌফিক দিন।

তার এক পৌত্র কাশেম মোস্তফা সাহেব এবং এক দৌহিত্র মুহাম্মদ সাফীর উদ্দীন সাহেব উভয়েই মুরব্বী। অনুরূপভাবে আরেক পৌত্র বেলাল আহমদ ওয়াকফে নও এবং এবছর ডাক্তার হয়ে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা তার প্রতি কৃপা ও ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। মুরব্বী গোলাম মুর্তজা সাহেব বিদেশে আল্লাহ্ তালার বার্তা পৌঁছানোর কাজে ব্যস্ত আর এ কারণে তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যেমনটি আমি বলেছি। আল্লাহ তা'লা তাকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে এই কষ্ট সহ্য করার তৌফিক দান করুন। জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ এ দের উভয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

****

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের জ্যোতিকে অব্যাহত রাখতে ইসতেগফার প্রয়োজন।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত: ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir